তরুণের স্বপ্ন

Published by

porua.org

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

তরুণের স্বপ্ন ... ১

দেশের ডাক ... ৬

গোড়ার কথা ... ১১

পত্রাবলী

তোমারই লাগিয়ে কলঙ্কের বোঝা ২২

সমাজ-সেবা ও কুটীর শিল্প ... ২৭

চরিত্র-গঠন ও মানসিক উন্নতি ... ৪০

জেল ও কয়েদী ৫৪

দলাদলি ও বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ ৬৬

হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট ... ৭৩

কারামুক্তির প্রস্তাবের উত্তর ... ৭৫

জীবনের লক্ষ্য ... ৮৭

উত্তর কলিকাতা অধিবাসীবৃন্দের নিকট নিবেদন ... ৯১

উত্তর কলিকাতা অধিবাসীগণের নিকট নিবেদন ... ৯৫

দেশবন্ধু (১) ... ৯৯

দেশবন্ধু (২) ... ১০৬

নিবেদন

গত ১৩৩০ সাল হইতে এখন পর্য্যন্ত আমার যে সকল পত্র ও প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, আজ তাহারই কয়েকটী সংগ্রহ করিয়া ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকাশিত হইল। সময়ের অল্পতা হেতু সকল পত্র ও প্রবন্ধ এখন প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। এই গ্রন্থখানি জনপ্রিয় হইলে ভবিষ্যতে অন্যান্য বিচ্ছিন্ন পত্র, রচনা ও বক্তৃতা একত্রে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ইতি—১০ই পৌষ, ১৩৩৫।

বিনীত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

১নং উডবার্ণ পার্ক,

কলিকাতা।

তরুণের স্বপ্ন

আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত—একটা বাণী প্রচারের জন্য। আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিবার জন্য যদি গগনে সূর্য্য উদিত হয়, গন্ধ বিতরণের উদ্দেশ্যে বনমধ্যে কুসুমরাজি যদি বিকশিত হয়, অমৃতময় বারিদান করিতে তটিনী যদি সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হয়—যৌবনের পূর্ণ আনন্দ ও ভরা প্রাণ লইয়া আমরা ও মর্ত্ত্যলোকে নামিয়াছি একটা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। যে অজ্ঞাত গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের ব্যর্থ জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে—ধ্যানের দ্বারা, কর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা।

যৌবনের পূর্ণ জোয়ারে আমরা ভাসিয়া আসিয়াছি সকলকে আনন্দের আস্বাদ দিবার জন্য, কারণ আমরা আনন্দের স্বরূপ। আনন্দের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে আমরা মর্ত্ত্যে বিচরণ করিব। নিজের আনন্দে আমরা হাসিব—সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও মাতাইব। আমরা যেদিকে ফিরিব, নিরানন্দের অন্ধকার লজ্জায় পলায়ন করিবে, আমাদের প্রাণময় স্পর্শের প্রভাবে রোগ, শোক, তাপ দূর হইবে।

এই দুঃখসঙ্কুল, বেদনাপূর্ণ নরলোকে আমরা আনন্দ-সাগরের বাণ ডাকিয়া আনিব।

আশা, উৎসাহ, ত্যাগ ও বীর্য্য লইয়া আমরা আসিয়াছি। আমরা আসিয়াছি সৃষ্টি করিতে, কারণ—সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দ। তনু, মন-প্রাণ, বুদ্ধি ঢালিয়া দিয়া আমরা সৃষ্টি করিব। নিজের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শিব আছে—তাহা আমরা সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিব। আত্মদানের মধ্যে যে আনন্দ সে আনন্দে আমরা বিভোর হইব, সেই আনন্দের আস্বাদ পাইয়া পৃথিবী ও ধন্য হইবে।

কিন্তু আমাদের দেওয়ার শেষ নাই; কর্ম্মেরও শেষ নাই, কারণ—

> "যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
> ফুরাবে না আর প্রাণ;
> এত কথা আছে এত গান আছে
> এত প্রাণ আছে মোর;
> এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
> প্রাণ হয়ে আছে ভোর।"

অনন্ত আশা, অসীম উৎসাহ, অপরিমেয় তেজ ও অদম্য সাহস লইয়া আমরা আসিয়াছি—তাই আমাদের জীবনের স্রোত কেহ রোধ করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের পর্ব্বতরাজি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াক,

অথবা সমবেত মনুষ্য-জাতির প্রতিকূল শক্তি আমাদিগকে আক্রমণ করুক,—আমাদের আনন্দময়ী গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণই থাকিবে।

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম আছে—সেই ধর্ম্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা নূতন, যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিন—তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নূতনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে। আমরা অতীত ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতা সব সময়ে মানিতে প্রস্তুত নই। আমরা অনন্ত পথের যাত্রী বটে কিন্তু আমরা অচেনা পথই ভালবাসি—অজানা ভবিষ্যৎই আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়। আমরা চাই "the right to make blunders," অর্থাৎ "ভুল করিবার অধিকার"। তাই আমাদের স্বভাবের প্রতি সকলের সহানুভূতি নাই, আমরা অনেকের নিকট সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা।

ইহাতেই আমাদের আনন্দ; এখানেই আমাদের গর্ব্ব। যৌবন সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সৃষ্টিছাড়া ও লক্ষ্মীহারা। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উন্মাদনায় আমরা ছুটিয়া চলি—বিজ্ঞের উপদেশ শুনিবার পর্য্যন্ত অবসর আমাদের নাই। ভুল করি, ভ্রমে পড়ি, আছাড় খাই, কিন্তু কিছুতেই আমরা উৎসাহ হারাই না বা পশ্চাৎপদ হই না। আমাদের তাণ্ডবলীলার অন্ত নাই, কারণ—আমরা অবিরামগতি।

আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সুচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোঁড়ামি, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সঙ্কীর্ণতা—সেইখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই। আমাদের একমাত্র ব্যবসায় মুক্তির পথ চিরকাল কণ্টকশূন্য রাখা, যেন সে পথ দিয়া মুক্তির সেনা অবলীলাক্রমে গমনাগমন করিতে পারে।

মনুষ্য জীবন আমাদের নিকট একটা অখণ্ড সত্য। সুতরাং যে স্বাধীনতা আমরা চাই—সে স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনধারণই একটা বিড়ম্বনা—যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যুগে যুগে আমরা হাসিতে হাসিতে রক্তদান করিয়াছি—সে স্বাধীনতা সর্ব্বতোমুখী। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল দিকে আমরা মুক্তির বাণী প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছি। কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা সত্যের আলোক, আনন্দের উচ্ছ্বাস ও উদারতার মৌলিক ভিত্তি লইয়া আসিতে চাই।

অনাদিকাল হইতে আমরা মুক্তির সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছি। শিশুকাল হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। জন্মিবামাত্র আমরা যে কাতরকণ্ঠে ক্রন্দন করিয়া উঠি সে ক্রন্দন শুধু

পার্থিব বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইবার জন্য। শৈশবে ক্রন্দনই আমাদের একমাত্র বল থাকে কিন্তু যৌবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলে বাহু ও বুদ্ধি আমাদের সহায় হয়। আর এই বুদ্ধি ও বাহুর সাহায্যে আমরা কি না করিয়াছি,—ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, ব্যাবিলোনিয়া, মিসর, গ্রীস, রোম, তুরস্ক, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি, রুশিয়া, চীন, জাপান, হিন্দুস্থান—যে কোনও দেশের ইতিহাস পড়িয়া দেখ—দেখিবে যে ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় আমাদের কীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। আমাদের সাহায্যে, সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন, আবার আমাদেরই অঙ্গুলিসঙ্কেতে সভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া তিনি পলায়ন করিয়াছেন। আমরা একদিকে প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রুরূপী তাজমহল যেমন নির্ম্মাণ করিয়াছি, অপরদিকে রক্তস্রোতে ধরণীবক্ষও রঞ্জিত করিয়াছি। আমাদের সমবেত শক্তি লইয়া সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য কলা, বিজ্ঞান যুগে যুগে দেশে দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে; আবার রুদ্র করালমূর্ত্তি ধারণা করিয়া আমরা যখন তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছি তখন সেই তাণ্ডব নৃত্যের একটা পদবিক্ষেপের সঙ্গে কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য ধূলায় মিশিয়া গিয়াছে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি আমরা বুঝিয়াছি, নিজের ধর্ম্ম চিনিয়াছি। এখন আমাদের শাসন বা শোষণ করে কে? এই নবজাগরণের মধ্যে সব চেয়ে বড় কথা, সব চেয়ে বড় আশা—তরুণের আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ। তরুণের প্রসুপ্ত আত্মা যখন জাগরিত হইয়াছে—তখন জীবনের মধ্যে সকল দিকে সকল ক্ষেত্রে যৌবনের রক্তিমরাগ আবার দেখা দিবে। এই যে তরুণের আন্দোলন—এটা যেমন সর্ব্বতোমুখী তেমনি বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবীর সকল দেশে, বিশেষতঃ যেখানে বার্দ্ধক্যের শীতল ছায়া দেখা দিয়াছে, তরুণসম্প্রদায় মাথা তুলিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়া সদর্পে সেখানে দণ্ডায়মান হইয়াছে। কোন্ দিব্য আলোকে পৃথিবীকে ইহারা উদ্ভাসিত করিবে তাহা কে বলিতে পারে? ওগো আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরা ওঠো, জাগো, ঊষার কিরণ যে দেখা দিয়াছে!

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দেশের ডাক

দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী বিদেশীকে ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীকে করতে হবে। বাঙ্গলার নর-নারীকে ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। কি উপায়ে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রধান সমস্যা।

জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গান্ধী অবাঙ্গালী হলেও এই আন্দোলনের সম্পর্কীয় কাজ বাঙ্গলাদেশে যে রকম প্রসার লাভ করেছে, অন্য কোনও প্রদেশে সে রকম করেনি। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ দেখার পর আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে অগ্রণী না হলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, স্বরাজ-সংগ্রামে বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বাগ্রে। আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার গুরুভার প্রধানতঃ বাঙ্গালীকে বহন করতে হবে। অনেকে দুঃখ করে থাকেন, বাঙ্গালী মাড়োয়ারী বা ভাটিয়া হলো না কেন? আমি কিন্তু প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যেন চিরকাল বাঙ্গালীই থাকে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ"। আমি এই উক্তিতে বিশ্বাস করি। বাঙ্গালীর পক্ষে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা আত্মহত্যার তুল্য পাপ। ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই।

বাঙ্গালীকে এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্ত্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙ্গালীকে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প কলা, শৌর্য্য-বীর্য্য, ক্রীড়ানৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এই সবের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালীকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় (cultural synthesis) করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙ্গালীর আছে।

আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষা, দীক্ষা, স্বভাব-চরিত্র এই সবের মধ্যে বাঙ্গালীর সেই বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল, বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সবুজ শ্যামল ক্ষেত্র ও তালগাছ-ঘেরা পুষ্করিণী—এই সবের মধ্যে কি একটা বৈশিষ্ট্য নাই? আর প্রকৃতি দেবীর এই বৈশিষ্ট্য কি বাঙ্গালীর চরিত্রে একটা বিশিষ্টতা প্রদান করে নি? এমন নরম

মাটিতে জন্মেছে বলেই বাঙ্গালীর এমন সরস প্রাণ! প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছে বলেই বাঙ্গালী সুন্দরের উপাসক হয়েছে। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জন্মভূমির অন্নজল সেবন করেই বাঙ্গালী কাব্যে ও সাহিত্যে এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশল দেখাতে পেরেছে।

গত দুই তিন বৎসর ধরে বাঙ্গলা দেশে যে জাগরণের বন্যা এসেছিল সে বন্যা এখন ভাঁটার দিকে চলেছে বটে কিন্তু জোয়ারের আর বেশী বিলম্ব নাই। বাঙ্গলা দেশে জাতীয়তার স্রোতে আবার প্রবল বন্যা আসবে। সে বন্যার স্পর্শে বাঙ্গলার প্রাণ আবার জেগে উঠবে। বাঙ্গালী সর্ব্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হবে!

এই নব জাগরণের স্বরূপ কি হবে তা' কে বল্‌তে পারে? এই নব যজ্ঞের পুরোহিত কে হবে তা' কে বলতে পারে? যে ভাগ্যবান পুরুষ এই যজ্ঞের পৌরহিত্য-ব্রত গ্রহণ করবেন তিনি এখন কোথায় বা কিরূপ সাধনায় তিনি এখন মগ্ন আছেন তা কে বলতে পারে? এই আন্দোলনের নেতৃত্ব মহাত্মা গান্ধী গ্রহণ করবেন অথবা কোনও নূতন মনীষী তাঁর আসনে বস্‌বেন —তা' আমরা জানি না।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য বসে থাকলে চলবে না। এই নব জাগরণের জন্য এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রস্তুত হতে হবে। ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, কর্ম্ম, ত্যাগ, ভোগ—এই সবের মাঝখান দিয়ে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হবে—যাতে ডাক এলে আমরা সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে শুধু দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এই সব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো, তোমাদের সবার প্রয়োজন আছে। ভগবান যদি করেন, তোমরা যদি শেষ পর্য্যন্ত জীবিত থাক—তবে স্বাধীন ভারত তোমরা ভোগ করতে পারবে। আর যদি স্বদেশসেবার পুণ্য প্রচেষ্টায় ইহ-লীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে মৃত্যুর স্বর্গের দ্বার তোমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হবে। তোমরা যদি প্রকৃত বীর সন্তান হও ত তবে এগিয়ে এসো।

হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই ত দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। আজ এই বিশ্বব্যাপী জাগরণের দিনে স্বাধীনতার বাণী যখন চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে তখন কি তোমরাই ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরাই তো চিরকাল "জীবন-মৃত্যু"কে "পায়ের ভৃত্য" করে রেখেছ—তোমরাই ত সকল দেশে আত্মদানের পুণ্য ভিত্তির উপর জাতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করেছ—তোমরাই ত যাবতীয় দুঃখ অত্যাচার সানন্দে গ্রহণ করে প্রতিদানে সেবা ও

ভক্তি অর্পণ করেছ। লাভের আকাঙ্ক্ষা তোমরা রাখনি, ভয় তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করেনি, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বীর সৈনিকের মত তোমরা হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করেছ। তোমাদের শৌর্য্য, বীর্য্য ও চরিত্রবল দেখে মাতা বসুন্ধরা তোমাদের শুভ্র ললাটে জয়-টীকা পরিয়ে দিয়েছেন।

ওগো বাঙ্গলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ-সেবার পুণ্য যজ্ঞে আজি আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। চারিদিকে মায়ের মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ঐ যে পূর্ব্বগগনে ভারতের ভাগ্য-দেবতা তরুণ তপনের রূপে দেখা দিয়েছেন। স্বাধীনতার পুণ্য আলোক পেয়ে চীন, জাপান, তুরস্ক, মিসর পর্য্যন্ত আজ জগৎ-সভায় উন্নতশিরে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমরা কি এখনও মোহাবেশে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমরা ওঠো, জাগো, আর বিলম্ব করলে চলবে না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদেশী বণিককে গৃহ প্রবেশের পথ দেখিয়ে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা যে পাপ সঞ্চয় করে গেছেন, এই বিংশ শতাব্দীতে তোমাদের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ভারতের নব-জাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। তাই বলছি, তোমরা সকলে এসো, ভ্রাতৃবন্ধনের "রাখি" পরিধান করে' মায়ের মন্দিরে দীক্ষা নিয়ে আজ এই প্রতিজ্ঞা করো যে, মায়ের কালিমা তোমরা ঘুচাবে, ভারতকে আবার স্বাধীনতার সিংহাসনে বসাবে এবং হৃত সর্ব্বস্বা ভারতলক্ষ্মীর লুপ্ত গৌরব ও সৌন্দর্য্য পুনরুদ্ধার করবে।

১১ই পৌষ, ১৩৩২

গোড়ার কথা

মানুষের জীবনে শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্য আছে, জাতীয় জীবনেও সেইরূপ ক্রমান্বয়ে এই সব অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। মানুষ মরে এবং মৃত্যুর পর নূতন কলেবর ধারণ করে—জাতিও মরে এবং মরণের ভিতর দিয়ে নবজীবন লাভ করে। তবে ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, সব জাতি মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠে না। যে জাতির অস্তিত্বের আর সার্থকতা নাই, যে জাতির প্রাণের সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়েছে—সে জাতি ধরাপৃষ্ঠ থেকে লোপ পায় অথবা কীট পতঙ্গের মত কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করতে থাকে এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাহিরে তার অস্তিত্বের আর নিদর্শন থাকে না।

ভারতীয় জাতি একাধিবার মরেছে—কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ-সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার (culture) মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য—এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষিগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না ক'রে কি মরতে পারি?

মনুষ্যদেহ পঞ্চভূতে মিশলেও জীবাত্মা কখনও মরে না। তদ্রূপ মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেও জাতির শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারাই তার আত্মা; জাতির সৃষ্টিশক্তি যখন বিলুপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে জাতি মরতে বসেছে। আহার, নিদ্রা ও সন্তানোৎপাদন তখন তার কার্য্যতালিকা হ'য়ে দাঁড়ায় এবং গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করাই তার একমাত্র নীতি বলে পরিগণিত হয়। এ অবস্থায় পড়েও কোনও কোনও জাতি আবার বেঁচে ওঠে, যদি তার অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। অন্ধকারময় যুগ যখন জাতিকে এসে গ্রাস করে, তখন সে কোনও প্রকারে নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার ধারা বাঁচিয়ে রাখে, অন্য জাতির সঙ্গে মিশে ভূত হয়ে যায় না। তারপর অদৃষ্ট বা ভগবানের ইঙ্গিতে আবার নব জাগরণ দেখা যায়। অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়; প্রসুপ্ত জাতি আবার চোখ খোলে; তার সৃষ্টি-শক্তি ফিরে আসে। সহস্রদল পদ্মের মত জাতির প্রাণধর্ম্ম আবার ফুটে ওঠে এবং নব নব রূপে, নব নব ভাবে ও নব নব দিকে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। এরূপ অনেক মৃত্যু ও জাগরণের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ ভারতের একটা mission আছে,—ভারতীয় সভ্যতার একটা উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।